প্রথম আলো

কলাম

মতামত

এমন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় লইয়া আমরা এখন কী করিব

লেখা: জিয়া আহমেদ

প্রকাশ: ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০: ২৫

গত এক দশকে সরকার ও নীতিনির্ধারকেরা প্রায় প্রতিটি জেলায় একটি করে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা করেন। বিগত সরকারের শেষ সময়গুলোতে যে নতুন বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, তার অধিকাংশই নানা সমস্যায় জর্জরিত। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অস্থায়ী ভবন ভাড়া নিয়ে ক্লাস শুরু হয়েছে; কিন্তু আধুনিক ল্যাব, গ্রন্থাগার, আবাসন, গবেষণাসুবিধা কিংবা পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ—যা একটি প্রকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের মৌলিক শর্ত, তার বেশির ভাগই অনুপস্থিত। অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা প্রাথমিক অবকাঠামো ও ন্যূনতম একাডেমিক পরিবেশ না

পেয়েই ডিগ্রির জন্য লড়াই করছেন। ফলে এসব প্রতিষ্ঠান মানসম্মত উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত ভূমিকা রাখতে পারছে না।

এ অব্যবস্থাপনার প্রভাব কেবল একাডেমিক পর্যায়েই সীমাবদ্ধ নয়, নতুন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হওয়া স্নাতক করা শিক্ষার্থীরা কর্মক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ছে। গবেষণার সুযোগ সীমিত হওয়ায় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা র‍্যাঙ্কিং নিচে নেমে যাচ্ছে। অন্যদিকে, অপরিকল্পিতভাবে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন সরকারের জন্য দীর্ঘ মেয়াদে আর্থিক চাপ বাড়াচ্ছে। কারণ, পরবর্তী সময়ে অবকাঠামো নির্মাণ, শিক্ষক নিয়োগ ও পরিচালনা খরচ বহন করা আরও কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এর ফলে বিদ্যমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আর্থিক ও গুণগত মানেও নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। এমনিতেই শিক্ষা খাতে আমাদের বাজেট বরাদ্দ তুলনামূলকভাবে কম; নতুন বিশ্ববিদ্যালয় খোলার এই প্রবণতা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করছে।

শিক্ষাবিদদের মতে, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আগে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের প্রয়োজন, মানবসম্পদের জোগান, গবেষণা-চাহিদা এবং অর্থনৈতিক সামর্থ্য যাচাই করা উচিত। শুধু নামফলক টাঙিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় চালু করলে তা ‘ডিগ্রি বিতরণকেন্দ্র’ হয়ে দাঁড়ায়। অথচ জ্ঞান উৎপাদন বা মানবসম্পদ উন্নয়নের আসল লক্ষ্য পূরণ হয় না।

উচ্চশিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য কেবল ডিগ্রি বিতরণ নয়; বরং জ্ঞান তৈরি, নতুন ধারণার উদ্ভব এবং দক্ষ মানবসম্পদ উৎপাদন। একটি বিশ্ববিদ্যালয় আসলে শুধু ভবন বা নামফলক নয়; এটি একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা ও গবেষণার ইকোসিস্টেম। শিক্ষক, আধুনিক গবেষণাগার, সমৃদ্ধ লাইব্রেরি, ছাত্রাবাস, নিরাপদ পরিবহনব্যবস্থা, স্বাস্থ্যসেবা ও ডিজিটাল সংযোগ—সবকিছু মিলেই একটি কার্যকর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি গড়ে ওঠে। এসব অনুপস্থিত থাকলে বিশ্ববিদ্যালয় কেবল নামেই টিকে থাকে; কিন্তু কাজের মাধ্যমে জাতিকে সমৃদ্ধ করতে পারে না।

বাংলাদেশের বাস্তবতা হলো, অনেক নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা বছরের পর বছর অস্থায়ী ভবনে ক্লাস করছেন, ল্যাবের অভাবে গবেষণা হচ্ছে না, লাইব্রেরিতে পর্যাপ্ত বই বা জার্নাল নেই, এমনকি আবাসনের অভাবে শিক্ষার্থীদের দূরদূরান্ত থেকে যাতায়াত করতে হচ্ছে। ফলে তাদের শিক্ষাজীবনে মানসিক চাপ, নিরাপত্তার সংকট ও সময়ের অপচয় যোগ হচ্ছে। এ অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল লক্ষ্য—জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন গৌণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

প্রতিটি জেলায় নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রচেষ্টা বন্ধ করা উচিত। বিদ্যমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মান বৃদ্ধি এবং আধুনিক ফ্যাসিলিটি যোগ করার দিকে মনোযোগ দিতে হবে। অবকাঠামো, মান ও মানুষকে প্রাধান্য দিলে নতুন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় সত্যিকার অর্থে দেশের, শিক্ষার্থীর এবং আঞ্চলিক উন্নয়নের জন্য কার্যকর হবে।

প্রতিটি জেলায় নতুন বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার প্রচেষ্টা রাজনৈতিক ও আঞ্চলিক প্রতিযোগিতার ফল। ‘আমাদের জেলাতেও বিশ্ববিদ্যালয় চাই’ এই দাবি প্রায়ই নির্বাচনী অঙ্গীকারের সঙ্গে যুক্ত হলেও বাস্তবতা ভিন্ন।

একটি বিশ্ববিদ্যালয় চালু করতে হলে যোগ্য শিক্ষক আকর্ষণ, আধুনিক ল্যাব-ফ্যাসিলিটি, স্থায়ী আবাসন, নিরাপদ পরিবহন ও অন্যান্য সহায়ক ব্যবস্থা তৈরি করা সময়সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল। কিন্তু শুধু নতুন বিশ্ববিদ্যালয় খোলার দিকে মনোযোগ দেওয়ায় শিক্ষার মান উপেক্ষিত হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় (সিরাজগঞ্জ) প্রতিষ্ঠার আট বছর পার হলেও স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মিত না হওয়ায় শিক্ষার্থীরা দীর্ঘদিন ধরে বিক্ষোভ করে আসছেন।

সমকাল (২২ জানুয়ারি ২০২৫) জানায়, শিক্ষার্থীরা মহাসড়ক অবরোধ করে স্থায়ী ক্যাম্পাস ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের দাবি তোলেন। প্রতিষ্ঠার ৯ বছর পার হলেও স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মিত না হওয়ায় শিক্ষার্থীরা অনুসারী আন্দোলনে অব্যাহত রয়েছেন। ২৭-২৯ জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত মহাসড়ক অবরোধ, প্রতীকী ক্লাস, রেলপথ অবরোধ, সাংস্কৃতিক প্রতিবাদ ও মৌন মিছিলসহ বিভিন্ন কর্মসূচি চালানো হয় একইভাবে, সুনামগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (এসএসটিইউ) এখনো স্থায়ী ক্যাম্পাস পায়নি; প্রথম আলোর (১৫ মে ২০২৪) প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে অস্থায়ী ভবনে পাঠদান হওয়ায় শিক্ষক-সংকট ও ল্যাব-সুবিধার অভাবে শিক্ষার্থীরা কার্যকর শিক্ষা পাচ্ছেন না। এসব উদাহরণ প্রমাণ করে যে সংখ্যার চেয়ে মানকে অগ্রাধিকার না দিলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কেবল নামফলকে সীমাবদ্ধ থেকে যাবে।

উচ্চশিক্ষার মান বজায় রাখতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আগে কয়েকটি মৌলিক শর্ত পূরণ জরুরি—

১. আধুনিক অবকাঠামো: ল্যাব, গবেষণাসুবিধা, আইটি সাপোর্ট, সমৃদ্ধ লাইব্রেরি ও ফিল্ডসাইট অপরিহার্য। এসবের অভাবে যেমন এসএসটিইউ ও এইচএইউ-তে শিক্ষার্থীরা হাতে-কলমে গবেষণা ও চর্চা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে.।

২. যোগ্য শিক্ষক ও গবেষক: কেবল পাঠদান নয়, গবেষণার জন্য দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ, প্রশিক্ষণ, এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম ও গবেষণা অনুদান প্রয়োজন। শিক্ষক-সংকটে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যেই শিক্ষার মান হারাচ্ছে।

৩. ছাত্রাবাস ও পরিবহন: মানসম্মত আবাসন, নিরাপদ যাতায়াত, স্বাস্থ্যসেবা ও সামাজিক বিকাশের সুযোগ জরুরি। এসএসটিইউ-র শিক্ষার্থীরা এসব সুবিধার অভাবে ভোগান্তিতে পড়ছেন, বিশেষত নারী শিক্ষার্থীরা।

৪. পরিবেশগত বিবেচনা: বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণে হাওর, চর, বিল বা নদীতীরের ভৌগোলিক বাস্তবতা, বন্যাঝুঁকি, জলাবদ্ধতা ও জীববৈচিত্র্য বিবেচনা না করলে পরিবেশের ক্ষতি ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় বাড়বে।

ওপরের বাস্তবতার আলোকে সরকারের করণীয় হলো একটি বাধ্যতামূলক ‘ইনফ্রা-রেডিনেস চেকলিস্ট’ প্রণয়ন করা। এটি অন্তর্ভুক্ত করবে—জমি অধিগ্রহণ, মাস্টারপ্ল্যান, পরিবেশ অনুমোদন, ল্যাব, লাইব্রেরি, আবাসন, স্বাস্থ্য ও

নিরাপত্তা, পরিবহনব্যবস্থা ও শিক্ষক-কর্মকর্তা-ডিজিটাল সংযোগ। নতুন বিশ্ববিদ্যালয় শুধু তখনই চালু হবে, যখন এই শর্তগুলো পূরণ হবে।

বিদ্যমান নতুন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সমস্যা সমাধানের জন্য আঞ্চলিক ক্লাস্টার ও কমন ল্যাব-ব্যবস্থা একটি কার্যকর সমাধান হতে পারে।

এখন প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় আলাদা করে ল্যাব স্থাপন করার চেষ্টা করছে; কিন্তু এর ফলে ব্যয় বাড়ছে অথচ মান নিশ্চিত হচ্ছে না। উদাহরণস্বরূপ একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় যৌথভাবে যদি হাই-অ্যান্ড মাইক্রোস্কপি, জেনোমিকস প্ল্যাটফর্ম, GIS ও রিমোট সেন্সিং ল্যাব, সয়েল-ওয়াটার অ্যানালিটিকস ল্যাব, সুপারকম্পিউটার ডেটা সেন্টার ব্যবহার করতে পারে, তাহলে ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে কমবে এবং শিক্ষার্থীরা বিশ্বমানের গবেষণার সুবিধা পাবেন। ভারত, দক্ষিণ কোরিয়া ও সিঙ্গাপুরের মতো দেশগুলোতে এই মডেল ইতিমধ্যে সফলভাবে কার্যকর হয়েছে, যেখানে গবেষণা ক্লাস্টার গড়ে তুলে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় একসঙ্গে ব্যবহার করছে।

এ ধরনের শেয়ারড ল্যাব মডেল শুধু খরচ সাশ্রয় করবে না; বরং মানসম্মত গবেষণাকে বিকেন্দ্রীভূত করে আঞ্চলিক পর্যায়েও বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষ নিশ্চিত করবে। যেমন সুনামগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (এসএসটিইউ) এবং হবিগঞ্জ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (এইচএইউ) যদি সিলেট অঞ্চলের একটি ‘হাওর রিসার্চ ক্লাস্টার’’-এর অংশ হিসেবে কাজ করে, তাহলে জলবিজ্ঞান, মাটিবিজ্ঞান ও কৃষি উদ্ভাবনে যুগান্তকারী গবেষণা সম্ভব হবে। একইভাবে উত্তরবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যদি একটি ‘নদী ও চর গবেষণা ক্লাস্টার’ গঠন করে, তাহলে সেখানে পরিবেশ ও কৃষি গবেষণার মান বহুগুণ বাড়বে।

প্রতিটি জেলায় নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রচেষ্টা বন্ধ করা উচিত। বিদ্যমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মান বৃদ্ধি এবং আধুনিক ফ্যাসিলিটি যোগ করার দিকে মনোযোগ দিতে হবে। অবকাঠামো, মান ও মানুষকে প্রাধান্য দিলে নতুন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় সত্যিকার অর্থে দেশের, শিক্ষার্থীর এবং আঞ্চলিক উন্নয়নের জন্য কার্যকর হবে।

নীতিনির্ধারক, সরকার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য স্পষ্ট বার্তা হলো—বিশ্ববিদ্যালয় কেবল ভবন নয়, এটি একটি জ্ঞান, গবেষণা ও সামাজিক-মানবিক দক্ষতা গড়ার প্রতিষ্ঠান। ‘বোর্ড-ফার্স্ট’ সংস্কৃতি থেকে বের হয়ে ‘ইনফ্রা-মান-মানুষ-প্রকৃতি-প্রথম’ নীতি গ্রহণ করলে নতুন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় সত্যিকারের আঞ্চলিক ও জাতীয় উন্নয়নের ‘জ্ঞান ইঞ্জিন’ হিসেবে কার্যকর হবে।

শিক্ষার্থীদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মানে কেবল পাঠদান নয়। এটি নিরাপদ আবাসন, নিশ্চিত ল্যাব, গবেষণার সুযোগ, মানসম্মত শিক্ষক ও ডিজিটাল সংযোগের সমন্বয়। যদি এসব শর্ত পূরণ করা হয়, তবে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কেবল ডিগ্রি বিতরণকারী প্রতিষ্ঠান নয়; বরং জ্ঞান, দক্ষতা ও উদ্ভাবনের কেন্দ্র হিসেবে জাতির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে।

অতএব সংখ্যা নয়, গুণমানকে অগ্রাধিকার দেওয়া এখন সময়ের দাবি। প্রতিটি সিদ্ধান্তে শিক্ষার্থীর বাস্তব চাহিদা, শিক্ষার মান ও স্থায়ী অবকাঠামোর ওপর জোর দেওয়া হলে বাংলাদেশ সত্যিকার অর্থে একটি মানসম্মত, টেকসই ও গবেষণাভিত্তিক উচ্চশিক্ষাব্যবস্থা অর্জন করতে পারবে।

লেখাটি শেষ করছি দুটি প্রতীকী ছোট গল্প দিয়ে। একজন কৃষক উর্বর জমিতে ধান রোপণ করলেন। কিন্তু তিনি সেচ, সার বা যত্নের ব্যবস্থা করলেন না। ফলে গাছ উঠলেও তা দুর্বল রইল, ফসল পূর্ণতা পেল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও চিত্র একই—কেবল নামফলক আর ভবন থাকলেই প্রতিষ্ঠান হয় না। গবেষণাগার, গ্রন্থাগার, শিক্ষক ও আবাসনের মতো প্রয়োজনীয় যত্ন না পেলে জ্ঞান নামের ফসলও অপূর্ণ থেকে যায়।

একসময় একটি ছোট শহরে ‘বিশ্ববিদ্যালয়’ নামের একটি প্রতিষ্ঠান চালু হলো। উদ্বোধনের সময় চারপাশে আনন্দোৎসব, ব্যানার আর বড় বড় বক্তৃতা—সবই ছিল। সবাই ভেবেছিলেন, এখান থেকে আগামী দিনের বিজ্ঞানী, গবেষক ও চিন্তাবিদ তৈরি হবেন। কিন্তু বাস্তবতা ছিল ভিন্ন। বিশ্ববিদ্যালয়টির নিজস্ব ক্যাম্পাস নেই, ক্লাস হচ্ছিল একটি পুরোনো স্কুল ভবনে। আধুনিক ল্যাব, সমৃদ্ধ লাইব্রেরি বা আবাসনের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। শিক্ষকও হাতে গোনা কয়েকজন।

শিক্ষার্থীরা স্বপ্ন নিয়ে ভর্তি হলেও দিন দিন তারা হতাশ হয়ে পড়ল। পরীক্ষায় তারা পাস করল, ডিগ্রিও পেল; কিন্তু কর্মক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারল না। কারণ, তাদের হাতে-কলমে শেখার অভিজ্ঞতা বা গবেষণার দক্ষতা গড়ে ওঠেনি। মানুষ বুঝতে পারল—কেবল নামফলক আর ভবন দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় হয় না; মানসম্মত শিক্ষা ও গবেষণার পরিবেশ না থাকলে সেই প্রতিষ্ঠান শুধু স্বপ্ন ভঙ্গের নামান্তর।

মূলকথা হলো সঠিক সম্পদ ছাড়া জ্ঞান বিকশিত হয় না আর সংখ্যা বাড়ানো নয়, গুণমান নিশ্চিত করাই টেকসই উচ্চশিক্ষার ভিত্তি।

- **ড. জিয়া আহমেদ** শিক্ষক, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট

prothomalo.com

সম্পাদক ও প্রকাশক: মতিউর রহমান

স্বত্ব © ১৯৯৮-২০২৫ প্রথম আলো